ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

পরিবেশ আইন ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মেহেদী মাসুদ *

Environmental Law: Bangladesh Perspective .

Mehedi Masud

Abstract. It is an undeniable fact that environmental law goes a long way in resolving the problem of environmental pollution. Since law has a binding effect, appropriate laws of environment should be enacted. Violation of environmental law on the part of a citizen would compile him to face consequences. To this end, a mass awareness program should be initiated specifying the consequences of the violation of environmental law. We must bear it in mind that life on earth depends on the proper maintenance of it. Therefore, judicial remedies need to be enforced and proper initiatives need to be undertaken to protect our environment and save the lives on earth. This paper attempts to discuss the environmental law in the context of Bangladesh. It also examines the judicial remedies and initiatives for protection environment in short.

পৃথিবীর সবদেশেই আত্মহনন প্রচেষ্টা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মানব জাতি এই আত্মহনন প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে পরিবেশ ধ্বংসের মাধ্যমে, যার নিদর্শন আমাদের চারপাশে বিস্তৃত। ব্রাজিলের রেইন ফরেষ্ট, ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকার তুসার শুভ্র হিমালয় এবং মেরুপ্রদেশও এই সর্বগ্রাসী দূষণের কবল থেকে মুক্ত নয়। এই ক্রমবর্ধমান পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য দরকার সম্মিলিত প্রয়াস, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, পরিবেশ বান্ধব আইন ও আইনী অনুশাসন এবং সর্বোপরি টিকে থাকার আকুতি। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব এই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। নরওয়ের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Grow Garlem Bruntland এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই Our Common Future নামে প্রকাশিত পুস্তকের মুখবন্ধে উল্লেখ করছিলেন, "The Environment is

---

* প্রশিক্ষণার্থী, পঞ্চবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বিপিএটিসি।

where we live" (Bruntland, 1987:Foreword) । অর্থাৎ এই ব্যাপারটি স্বতঃসিদ্ধ যে ধরিত্রীর বুকে জীবন প্রবাহের জন্য দরকার পরিবেশের সুষ্ঠু সংরক্ষণ। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য চাই একটি সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থা যা দূষণমুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম। পরিবেশ আইন এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে বহুলাংশে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের আদালত ও বিচার ব্যবস্থা পরিবেশ ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবেশ দূষণ এমন একটি বিষয় যেখানে আপামর জনগণের স্বার্থ জড়িত। জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একমাত্র আদালতই সঠিক সিদ্ধান্ত/রায় প্রদান করতে পারে।

পরিবেশ আইন একটি ব্যাপক বিষয়। এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্বল্প পরিসরে একটি দুঃসাধ্য কাজ। অন্য কথায়, প্রায় অসম্ভব। তাই পরিবেশ আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ শুধুমাত্র এই নিবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, আলোচ্য নিবন্ধে পরিবেশ আইন এবং রাষ্ট্রীয় অপরাপর অধ্যাদেশ ও আইন যেগুলো পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সেগুলা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বাংলাদেশ হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২- এটি সরাসরি কোন পরিবেশ আইন নয়। তা সত্ত্বেও এটি আলোচনায় এসেছে কেননা এই অধ্যাদেশের ৫ (২) অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ

১৯৭২ সনে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় UN Conference on Human Environment। এই সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ষ্টকহোম সম্মেলনের ফলো-আপ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রকল্প শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে। পানি দূষণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ ঘোষণার মাধ্যমে প্রকল্পটির যাত্রা শুরু হয়। মূলতঃ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণই ছিল প্রকল্পটির লক্ষ্য। ১৯৭৭ সালে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হয় প্লানিং কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে। এছাড়া একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠিত হয় একই সালে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৩নং অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র খনিজ সম্পদের কথা বলা হয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সংবিধানের কোথাও নেই। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি নইমুদ্দিনের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্যঃ "Although by sub Clauses (a) and (b) of clause (1) of the Article 143, all minerals and others things underlying any land and all lands minerals and other things of value underlying the ocean within the territory of Bangladesh vest in the Republic, no specific provision has been made anywhere in the constitution for protection of environment" (Naimuddin, 1997). পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক কিছু বিধি বিধানের উল্লেখ Cr.Pcতে রয়েছে। Cr.Pc-র ১০ ও ১১ অধ্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাবলিক পার্ক এ্যাক্ট ১৯০৪, স্মোক ন্যুইস্যান্স এ্যাক্ট ১৯০৫, ডেস্ট্রাকটিভ ইনসেক্টস এন্ড পেস্টস এ্যাক্ট ১৯১৪, প্রিজনস এ্যাক্ট ১৯১৯, এগ্রিকালচারাল এন্ড সেনিটারী ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯২০, মাইনস এ্যাক্ট ১৯২৩, দি ফ্যাকট্রিস এ্যাক্ট ১৯৬৫, বাংলাদেশ হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ প্রভৃতি আইনে পরিবেশ দূষণ ও এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সনে পরিবেশ নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. এটা সুসংবদ্ধ, পরিকল্পিত ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে জনশক্তি ব্যবহারকে নিশ্চিত করে।

২. এটা পরিবেশ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে, সরকারের জনসংখ্যা নীতি বিষয়ে সমৃদ্ধ ধারণার সূত্রপাত করে ও তদসংক্রান্ত এ্যাকশন প্রোগ্রামে সহায়তা করে।

৩. এটা উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে।

৪. এটা বেকার জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল স্তরে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহ প্রদান করে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

১. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সঠিক উন্নয়ন।

২. দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করা।

৩. সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

৪. সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৫. সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

৬. পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে যথা সম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ এর আইনগত কাঠামো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, নীতিতে প্রথমেই প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে বর্তমান আইন সময়োপযোগী করে সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ নীতি ১৯৯২ এর আইনগত কাঠামো নিম্নরূপঃ

- পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করে সংশোধন।
- পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন।
- প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এ সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি।
- পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তা অনুমোদন এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রচেষ্টা/ফলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

অর্থাৎ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে দূষণেরও প্রকৃতিগত/মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রচলিত আইনের সংশোধনের

প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এই পরিবেশ নীতিতে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

পরিবেশ নীতিতে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে নারীর অংশগ্রহণের ধারণাটি। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সকল দিকই পরিবেশ নীতিতে স্থান পেয়েছে। মোটামুটিভাবে এ যাবত প্রণীত আইনসমূহ, যেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশ রক্ষার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. স্থানীয় সরকারগুলোর কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহঃ বেঙ্গল লোকাল সেলফ গর্ভনমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯, বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৩৫, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩১, যার সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ হলো পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭। এ ছাড়া আরো রয়েছে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩। উপর্যুক্ত আইন-অধ্যাদেশসমূহে পরিবেশের কিছু কিছু উপাদান যেমনঃ বৃক্ষরোপণ, পুকুর খননের মাধ্যমে পানীয়জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৬ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। তেমনি ৬ (ঞ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাস্তার পাশে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও তার সংরক্ষণ করতে হবে।

২. পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন ঃ ফ্যাকট্রিজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ এবং ফ্যাকট্রি রুলস, ১৯৭৯ এর আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশকে একটি শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফাকট্রি রুলস ১৯৭৯ এ সুনির্দিষ্ট রূপে বলা হয়েছে যে, কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের জন্য দায়ী থাকবে। টি প্ল্যানটেশন লেবার অর্ডিন্যান্স ১৯৬২, শপ্স এন্ড এষ্টাবলিশমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৬৫, পেষ্টিসাইড অর্ডিন্যান্স ১৯৭১, এগ্রিকালচারাল পেস্টিসাইড্স (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৮০ এবং এগ্রিকালচারাল পেষ্টিসাইডস অর্ডিন্যান্স (এমেন্ডমেন্ট), ১৯৮৩ দ্বারা কর্মপরিবেশে পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার

নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন ও পুষ্টি স্তর বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক আইন ঃ বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ, বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন পাশ করেছে। ফরেষ্ট্রি এ্যাক্ট এর আওতায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিধান রয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলকে সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ (প্রিজার্ভেশন) অর্ডর ১৯৭৩, ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অফ ফিশ (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৮২, মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যন্স, ১৯৮৩ প্রভৃতি আইন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপর আলোকপাত করেছে।

৪. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত আইন ঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭০ এর মাধ্যমে। স্বাধীনতাত্তোর কালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ (সংশোধিত) ১৯৭৩এ কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। এই আইনটি শুধুমাত্র পানি দূষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বায়ুদূষণ, শিল্প-বর্জ্য, এই সব বিষয় এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলনা। এই সীমাবদ্ধতাবোধ থেকে নতুন একটি সর্বব্যাপী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ জারী করেন। এই আইনে পানি দূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ পরিবেশ নীতির ৪.২ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রণীত হয়েছে। আইনের অনুচ্ছেদ ২ (খ), (ঘ) (ঞ), অনুচ্ছেদ ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২০ আংশিক ও পরোক্ষভাবে কৃষি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। এই আইনবলে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও আইন লংঘনের শাস্তির বিধান হয়েছে এই আইনে। কিন্তু সীমিত জনবল, কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৮এ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা

পরিচালককে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছেঃ

১. পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্যক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহা পরিচালককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

২. এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদত্ত কোন আবেদন নিষ্পত্তিকল্পে মহাপরিচালক শুনানিসহ যে কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন।

৩. যে ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন অভাবিত কাজ অথবা ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ নির্গত হয় বা নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করতে বাধ্য থাকবেন।

৪. উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তি মহা পরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করবেন।

৫. এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হলে মহা পরিচালক যতশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং মহাপরিচালকের চাহিদা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি মহা পরিচালককে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

৬. এই অনুচ্ছেদের অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হতে মহা পরিচালকের পাওনা হবে এবং তা সরকারী দাবী হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ১৫অনুচ্ছেদে আইন ভঙ্গের যে সব দন্ড উল্লেখ করা আছে সেগুলো হলোঃ

১. যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধির লঙ্ঘন করেন অথবা আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তা হলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

২. কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী অথবা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মহা পরিচালক হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বা ওজর ব্যতীত সাহায্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন বা তাকে দায়িত্ব সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটান বা বাধাদান করেন তা হলে তিনি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক। কিন্তু কৃষি পরিবেশের উপর পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালাটি প্রকৃতপক্ষে শিল্প কারখানার উপরই গুরুত্ব প্রদান করেছে।

জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (NEMAP), ১৯৯৫

১৯৯২ সনে ইউএনডিপি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টাদের সহায়তায় জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সনে দুই বার সরকারের প্রয়াস সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৯৯৫ সনে পরিকল্পনাটি পূণর্মূল্যায়নের পর পুনঃপ্রণীত হয়। এই পরিকল্পনায় কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত সমস্যা হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ, জমির উর্বরতা হ্রাস, জৈব বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শও এই পরিকল্পনায় দেয়া হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা (NEMAP), ১৯৯৫ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত করেছে যেগুলি যথাযথভাবে সম্বোধিত হলে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হবে বলে আশা করা যায়। পরিবেশগত ইস্যুসমূহ সারণী ১-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ১। পরিবেশগত ইস্যু

প্রতিষ্ঠানিক ইস্যু	খাতওয়ারী ইস্যু	স্থানগত ইস্যু	দীর্ঘমেয়াদী ইস্যু
আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়; জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, আইন প্রণয়ন ও মনিটরিং।	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, জৈব বৈচিত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিক্ষা, পানি, কৃষি, শক্তি, মৎস্য সম্পদ, ভূমি, আবাসন এবং পরিবহন।	লবণাক্ততা, চিংড়ি চাষ উপকূলীয় সামুদ্রিক ইস্যু বরেন্দ্রভূমি, জলাভূমি, পাহাড় কাটা।	আঞ্চলিক পানির হিস্যা নগরায়ন, পরিবহন, গবেষণা ও উন্নয়ন।

সূত্রঃ ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট (1999) ফর লাইফ অন আর্থ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরিবেশ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. বীজের মান বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল (এইচওয়াইভি) এবং সংকর বীজের মানোন্নয়ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা;

২. স্বল্প ব্যয়ে কৃষি উপকরণ সরবরাহের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপর অধিক নির্ভরতার মাধ্যমে আধুনিক সেচ ও কম ঝুঁকি সমন্বিত কৃষির প্রতিষ্ঠা; এ জন্য গণখাতের বিনিয়োগকে অধিকতর কার্যকর করা হবে। এমন সব গুরুত্বপর্ণ ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ করা হবে যাতে ব্যক্তি উদ্যোগ উৎসাহিত হয়;

৩. কৃষি গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে যাতে ফসলের জাত, খামার ব্যবস্থা, জৈব উপকরণভিত্তিক খামার, উন্নত কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থা এবং কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ (processing) সংক্রান্ত নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং রক্ষিত প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার ঘটে;

৪. পরিবেশ-অনুকূল এবং টেকসই প্রযুক্তি যেমন সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশল এবং জৈব ও জীবভিত্তিক সারের ব্যবহারের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করা হবে;

৫. সুষম শস্য উৎপাদন এবং জনগণের পুষ্টি-মানের (nutritional status) উন্নয়নের জন্য অ-প্রধান শস্যসমূহের লাভ জনক উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে;

৬. বৃষ্টি নির্ভর এলাকা, শুষ্ক অঞ্চল এবং জলাভূমি কৃষি ব্যবস্থার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হবে;

৭. ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমির জৈব পদার্থের উন্নততর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জৈব সারের উৎপাদন এবং ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৮. উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিজস্ব উদ্যোগে গঠিত কৃষি পণ্যের ব্যবসা অব্যাহত রাখা, অধিক পরিমাণে ঋণকৃত পুঁজি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি গ্রহণ এবং তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যাতে জোট ও সমিতি গঠন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৯. কৃষির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

১০. জার্ম প্লাসম (Germ plasm) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও কৌল (Family) সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হবে;

১১. বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

১২. কৃষি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের স্বার্থে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করা হবে;

১৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিজ ও গ্রামীণ অর্থনীতি যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা সহনীয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৪. গ্রামীণ যুব মহিলা এবং যুবকেরা যাতে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামর্থের উন্নয়ন করা হবে;

১৫. পরিবর্তিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হবে;

১৬. ফসল কাটার পরবর্তী সময়ে শস্যহীন এবং শস্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করার জন্য ফসল উৎপাদন ও আহরণের পরবর্তী পর্যায়সমূহের জন্য জুতসই এলাকাভিত্তিক ব্যয় সংকোচন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটানো হবে; এবং

১৭. টেকসই কৃষি সহায়ক নীতি গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ রীতি প্রয়োগ করা হবে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, সরকার টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা এখানে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও জৈব সার ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। পরিবেশ আইন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই একটি নয়া সংযোজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি নবীনতম। তথাপি পরিবেশ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা অবশ্যই আশা-সঞ্চারক। এটা ঠিক যে অসম্পূর্ণ ও সেকেলে আইন দ্বারা প্রায়শই বর্তমান চাহিদার নিরিখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পরিবেশগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয় দুটি কারণেঃ (ক) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও (খ) সংবিধিবদ্ধ পরিবেশগত মানের অনুপস্থিতি যার ভিত্তিতে অপরাপর মান যাচাই করা সম্ভব। আসলে আইনে শাস্তিমূলক বিধান না থাকায় আইন ভঙ্গকারীরা পার পেয়ে যায়।

আইনী প্রতিকার

আধুনিক পরিবেশ আইনে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জনবলের অভাবেই হোক বা ইচ্ছার অভাবেই হোক, দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসসমূহ পরিবেশ আইন বাস্তবায়নে কোন না কোনভাবে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় একজন ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক তিনটি উপায়ে আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারে– (১) দূষণকারীর বিরুদ্ধে Tort Law Action; (২) রিট পিটিশন দায়ের করা যাতে করে সরকারী প্রতিষ্ঠানটি বাধ্য হয় আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে এবং (৩) নাগরিক অধিকার ক্ষুন্নের মামলা।

সাধারণ পাবলিক ন্যুইন্যান্স, অবহেলা প্রভৃতি কারণে Tort Law Action নেয়া হয়। আইনবিদগণ nuisance এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে "A nuisance is an unlawful interference with the plaintiff's use for enjoyment of land. Of the two kinds of nuisances, public nuisance injures, annoys, interferes with the quality of life of a class of persons within a neighbourhood. অপরের জীবন যাত্রা বা শান্তিপূর্ণ জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই পাবলিক নুইন্যান্স। পাবলিক নুইন্যান্সের আইনী প্রতিকারসমূহ হচ্ছে- (১) স্পেশাল কোড ১৮৬০ এর সেকশন ২৬৮ অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা রুজু করা এবং (২) Cr. Pc-র সেকশন ১৩৩-১৪৪ অনুযায়ী পাবলিক ন্যুইন্যান্স দূরীকরণের লক্ষ্যে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায়। আর অবহেলা জাতীয় ব্যাপারে ফরিয়াদীকে অবশ্যই এটা প্রমাণ করতে হবে যে, (১) বিবাদী কর্তব্যরত ছিলেন এবং কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন এবং (২) কর্তব্যে অবহেলার কারণে ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতের মুকেশ টেক্সটাইল মিলস কেস, ১৯৮৭ এর কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে রিট আবেদন করা যায়।

উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক যাবতীয় কর্মকৌশল ও পন্থাসমূহের মধ্যে আইনগত পন্থাই অধিকতর ফলপ্রসূ। কেননা আইন মান্য করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ আইন যথার্থ ভূমিকা রাখবে। এজন্য দরকার পুরাতন আইনের সংস্কার সাধন, নতুন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন। প্রয়োজনে পরিবেশপ্রেমিক নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স মওকুফের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে অন্যান্য সকলেই উৎসাহিত হয়। সম্প্রতি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পরিবেশ কর (Environmental Tax) আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮৯ সনে বৃটেনে সীসা মিশ্রিত পেট্রোলের (Leaded Petrol) উপর ৮% বেশী ট্যাক্স আরোপ করা হয়। কেননা সীসা মিশ্রিত পেট্রোল পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশেও আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) পরিবেশ আন্দোলনে

সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রয়োজনে এনভায়রনমেন্টাল অডিট (Environmental Audit) ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে প্রতি মহল্লায়। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ আদালত স্থাপনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ১০ই এপ্রিল, ২০০০ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পরিবেশ আদালত বিলে স্বাক্ষর করেন। পরিবেশ আদালত স্থাপিত হলে পরিবেশ ইস্যু আরো জোরদার হবে। সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সনে বেলা Eco-System বিনষ্টের জন্য ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে বেলা মামলায় জয়লাভ করে। সুতরাং একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আইনের একটি অবশ্য পালনীয় প্রভাব রয়েছে। শুধুমাত্র আইনেরই রয়েছে বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেয়ার ক্ষমতা। এজন্য প্রচলিত আইনসমূহ বাস্তবতার নিরিখে সংশোধন করে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ পূর্ববর্তী বাতিলকৃত পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেকেলে ও অকার্যকর বিবেচিত হওয়ার কারণে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশে, ১৯৭৭ বাতিল করা হয়।

তথ্য নির্দেশিকা

Agnihotri S. P. (1992) *Environment Conservation Management and Planning.* New Delhi: Chugh Publication.

Ahmed, Naimuddin (1997) *Public Interest Environment Litigation in Bangladesh.* Dhaka : BELA.

Aminullah (1992) *Environment and Development.* Peshawar: Pakistan Academy for Rural Development.

Benedick, R. E (1991) Ozone Diplomacy : *New Directions in safe guarding the Planet.* USA : Harvard University Press.

Bruntland Grow Garlen (1987) *Our Common Future.* Report of the World Commission on Environment and Development. London: Oxford University Press.

Farooque, Mahiuddin (1997) *Laws and Custom on Forests in Bangladesh: Issues and Remedies.* Dhaka: BELA.

GOB. (1999) *For Life on Earth.* Dhaka : Department of Environment.

GOB (1998) *Fifth Five Year Plan 1997-2002.* Dhaka : Planning Commission.

Mathur Mahesh (1996) *Legal Control of Environmental Pollution's : Jurisprudence and laws applicable to environmental violation and prevention.* New Delhi : Deep & Deep Publications.

Miller, A.L.M (1995) *The Third World in Global Environmental Politics.* London : Bucking ham University Press.

Sapru, R.K. ed. (1987) *Environment Management in India.* New Delhi : Ashish Publishing House.

UNEP (1990) *Profile.* Nairobi: UNEP